চা- শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থা

সেলিম মাসুদ, সহকারী অধ্যাপক

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর একটি জনপ্রিয় স্লোগান হলো ' কেউ পিছনে পড়ে থাকবে না '। সকলকে নিয়েই সবার জন্য টেকসই উন্নয়ন। চা বাগানের অধিকাংশ শ্রমিকই নারী। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে তারা এখনো সমাজের মূল ধারা থেকে অনেক পিছিয়ে, এখানে দারিদ্র্যের হারও অনেক বেশি। চা শ্রমিকরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, গর্ভবতী নারীর সেবাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষকরে সামাজিক নিরাপত্তাসহ প্রায় সবক্ষেত্রেই পিছিয়ে রয়েছে। এ খাতে কর্মরত শ্রমিক কম-বেশি পনে তিন লক্ষ। এ সব শ্রমিকের বেশির ভাগই নারী শ্রমিক। এসব নারী চা শ্রমিকরা বংশ পরম্পরায় এ খাতে কাজ করে থাকে।

চা উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে নবম,প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থানে আছে চীন এবং ভারত। বাংলাদেশে নিবন্ধিত চা বাগান ও টি স্টেট রয়েছে ১৬৭ টি, এর মধ্যে সিলেট বিভাগে রয়েছে ১২৯ টি। চা বাগান করতে গেলে ন্যূনতম ২৫ একর জমি লাগে। সে হিসেবে ৪ হাজার একরেরও বেশি নিবন্ধিত জমিতে চা চাষ হচ্ছে। তবে অনিবন্ধিত ক্ষুদ্র পরিসরের বাগান এর দ্বিগুণেরও বেশি। ২০২১ সালে দেশে মোট চা উৎপাদন হয়েছে ৯ কোটি ৬৫ লাখ কেজি। চা এর অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরীন বাজারে চা এর চাহিদা প্রায় ১০ কোটি কেজি। আমাদের দেশিও উৎপাদন থেকে চাহিদা সম্পূর্ণ পূরণ হয়না, কিছুটা ঘাটতি থাকে, তা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করতে হয়। দুই দশক আগেও বাংলাদেশ থেকে কম বেশি এক কোটি ৩০ লাখ কেজি চা রপ্তানি হতো। আর এখন সেখানে খুবই সীমিত আকারে ৬ লাখ থেকে ২০ লাখ কেজি রপ্তানি করা হয়। কারণ আমাদের অভ্যন্তরিন চাহিদার ঘাটতি রয়েছে। তাই ২০২৫ সাল নাগাদ সরকার চা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ১৪ কোটি কেজি। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার ইতিমধ্যে নানারকম পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এর মধ্যে উত্তরাঞ্চলের চা চাষিদের ' ক্যামেলিয়া খোলা আবাশ স্কুলের ' মাধ্যমে চা আবাদ বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিতকরণ ও প্রযুক্তি সরবরাহ করা হয়েছে । এর ফলে সমতলে চা বাগান ও ক্ষুদ্র চা চাষীদের চা উৎপাদন ২০২০ এর থেকে ২০২১ সালে ৪১ শতাংশ বেশি হয়েছে, যা এ খাতের জন্য আশাব্যাঞ্জক। সত্তর দশকে প্রতি হেক্টর জমিতে ৭৫০ কেজির মতো চা উৎপাদন হতো। আধুনিক প্রযুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে চা উৎপাদনের ফলে এখন জমি ভেদে প্রতি একরে কম বেশি ১ হাজার ৫ শত থেকে ৩ হাজার ৫ শত কেজি চা উৎপাদন হচ্ছে। চা চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী হলো প্রচুর বৃষ্টিপাত ও উঁচু জমি। যেন প্রচুর বৃষ্টি হলেও দ্রুত পানি নিষ্কাশন হয়ে যায়।

নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত এ ছয় মাস হলো শুষ্ক মৌসুম, এসময় চা এর ফলন ঠিক রাখতে খরা সহিষ্ণু চা এর দুইটি জাত উদ্ভাবন করছে আমাদের চা গবেষণা ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিরা। পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় পানীয়গুলোর একটি হলো চা। চা পান সর্বপ্রথম শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব ২০০ চীনে। পৃথিবীতে যত ধরনের চা উৎপাদন হয় তার সবই তৈরি হয় ক্যামেলিয়া সিনেসিস থেকে। এই চির হরিৎ গুল্ম বা ছোট গাছ থেকে পাতা এবং এর কুঁড়ি সংগ্রহ করে তা চা উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ধরনের চা এর মধ্যে উদ্ভিদের ধরনের এবং উৎপাদনের প্রক্রিয়াতে ভিন্নতা রয়েছে।

আঠারো শতকের প্রথমার্ধে ভারতবর্ষের আসাম ও তৎসংলগ্ন এলাকায় প্রথম চা চাষ শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী নদীর তীরে চা আবাদের জন্য ১৮২৮ সালে জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেখানে চা চাষ শুরু করা সম্ভব হয় নি। পরবর্তীতে ১৮৪০ সালে চট্টগ্রাম শহরের বর্তমান চট্টগ্রাম ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় একটি চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা কুন্ডদের বাগান নামে পরিচিত। তারপর ১৮৫৪ সালে মতান্তরে ১৮৪৭ সালে বর্তমান সিলেট শহরের এয়ারপোর্ট রোড়ের কাছে মালিনীছড়া চা বাগান প্রতিষ্টা হয়। মূলত মালিনীছড়া চা-বাগানই বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্যিক চা বাগান। দেশ স্বাধীনের পূর্বে বাংলাদেশে মূলত দুইটি জেলায় চা বাগান ছিলো। এর একটি সিলেট জেলায়, যা সুরমা ভ্যালি এবং অপরটি চট্টগ্রাম জেলায় যা হালদা ভ্যালি নামে পরিচিত ছিল।

বাংলাদেশ বিশ্বের একটা বড়ো চা উৎপাদনকারী দেশ। চা শিল্প বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশ্বের বড়ো দশটি চা বাগান আছে আমাদের দেশে। চা শিল্পের সাথে জড়িত অনেকেই অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং হচ্ছেন। পাশাপাশি একশ্রেণির দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু চা বাগানের দরিদ্র শ্রমিকদের বছরের পর বছর তাদের জীবনমানের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হচ্ছেনা। নারী প্রধান চা শ্রমিক পরিবারের দারিদ্র্যের হার খুব বেশি। চা শ্রমিকদের মধ্যে বাল্য বিবাহের হার খুব বেশি। যদিও সরকারি, বেসরকারি এবং এনজিও চা শ্রমিকদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করতে নানা রকম কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এরই ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাল্য বিবাহের হার কিছুটা কমেছে। তবে তা কোনোভাবেই যথেষ্ট না। চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরি অনেক কম। একজন চা শ্রমিক দৈনিক ১২০ টাকা হারে মজুরি পান, এর সাথে রেশন পান। বাগানে সাধারণত একটি পরিবারের দুই তিনজন আয় করে। কিছু সীমিত চিকিৎসা সুবিধা, শিশুদের জন্য লেখাপড়াসহ আরও কিছু সুযোগ সুবিধা আছে। তবে বাগান ভেদে এবং স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবে

সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক চা বাগানের মালিকরা স্থায়ী চা শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থা করেছে। ৬০ বছর বয়সে অবসরে যাওয়ার সময় তারা একটা এককালীন আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকেন এবং ১৫০-২০০ টাকা মতো সাপ্তাহিক ভাতা পেয়ে থাকেন। যিনি অবসরে যান তার শূন্য পদে পরিবারের সদস্যদের চাকরির ব্যবস্থাও করা হয়। চা শ্রমিকদের কম বেশি ৬০ শতাংশ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে দেশের প্রায় শতভাগ শিশু প্রাথমিকে ভর্তি হয়। চা বাগানগুলোতে ১৭০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এছাড়াও আছে এনজিওদের নানা রকম শিক্ষা কর্মসূচি। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য মাসিক শিক্ষাভাতা চালু আছে, কিন্তু এনজিও স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের জন্য কোন ভাতার ব্যবস্থা নেই। তবে চা বাগানের দরিদ্র শিশুদের শিক্ষার বিষয়টি সরকার গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে ইতিমধ্যে শতভাগ শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করতে নানা রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এটি একটি চলমান কার্যক্রম। চা বাগানে ১৯৩৯ সাল থেকে মাতৃত্ব আইন চালু আছে। একজন গর্ভবতী নারী ৮ থেকে ১৬ সপ্তাহের মাতৃত্বকালীন সুবিধা পান। তাদের জন্য প্রশিক্ষিত মিডওয়াইভস, নার্স ও চিকিৎসক রয়েছে। তবে এ সুবিধা শুধু মাএ নিবন্ধিত শ্রমিকদের জন্য। চা বাগানের অবস্থান প্রান্তিক অঞ্চলে হওয়ায় এ বাগানগুলোর আশেপাশের তেমন কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে নি। চা বাগানে বিশ্রামের জন্য কোন বিশ্রামাগার নেই, পানির ব্যবস্থা নেই। দূষণের কারণে সাধারণত কোন ফসলের পাশে শৌচাগার থাকে না। এজন্য চা বাগানের থেকে শৌচাগার দূরে রাখা হয়। এতে চা বাগানের নারী শ্রমিকদের জন্য সমস্যা হয়ে থাকে। চা শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সরকার ২০১৬ সালে চা শিল্পের জন্য একটি রোড়ম্যাপ করে যা ২০১৭ সালে অনুমোদন পায়। এখানে চা শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের উল্লেখ রয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে ৫০ হাজার চা শ্রমিককে সরকার প্রতিবছর এককালীন পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও সারা দেশের ন্যায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা,স্বামী নিগৃহীতা ভাতা, প্রতিবন্ধী, শিক্ষা উপবৃত্তি ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী জীবন মান উন্নয়ন ভাতাসহ সকল সরকারি সুবিধা চা বাগানের শ্রমিক পরিবারগুলো পেয়ে থাকে।

বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য হলো ২০৩০ এর মধ্যে এসডিজি এবং ২০৪১ এ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মানে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ। এরই ধারাবাহিকতায় ইতিমধ্যে চা শিল্পের উন্নয়ন এবং এর সাথে যুক্ত বিভিন্ন অংশীজনের কল্যাণে চাহিদার ভিত্তিতে টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, গর্ভবতী নারীদের সেবাসহ চা বাগানের দরিদ্র শ্রমিকদের জাতীয় গড় উন্নয়নের মূল ধারায় সংযুক্ত করার লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করছে। এসকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একটি দারিদ্র্যমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে বসবাস করবে,এটাই প্রত্যাশা।

#

৩১.০৭.২০২২ পিআইডি ফিচার